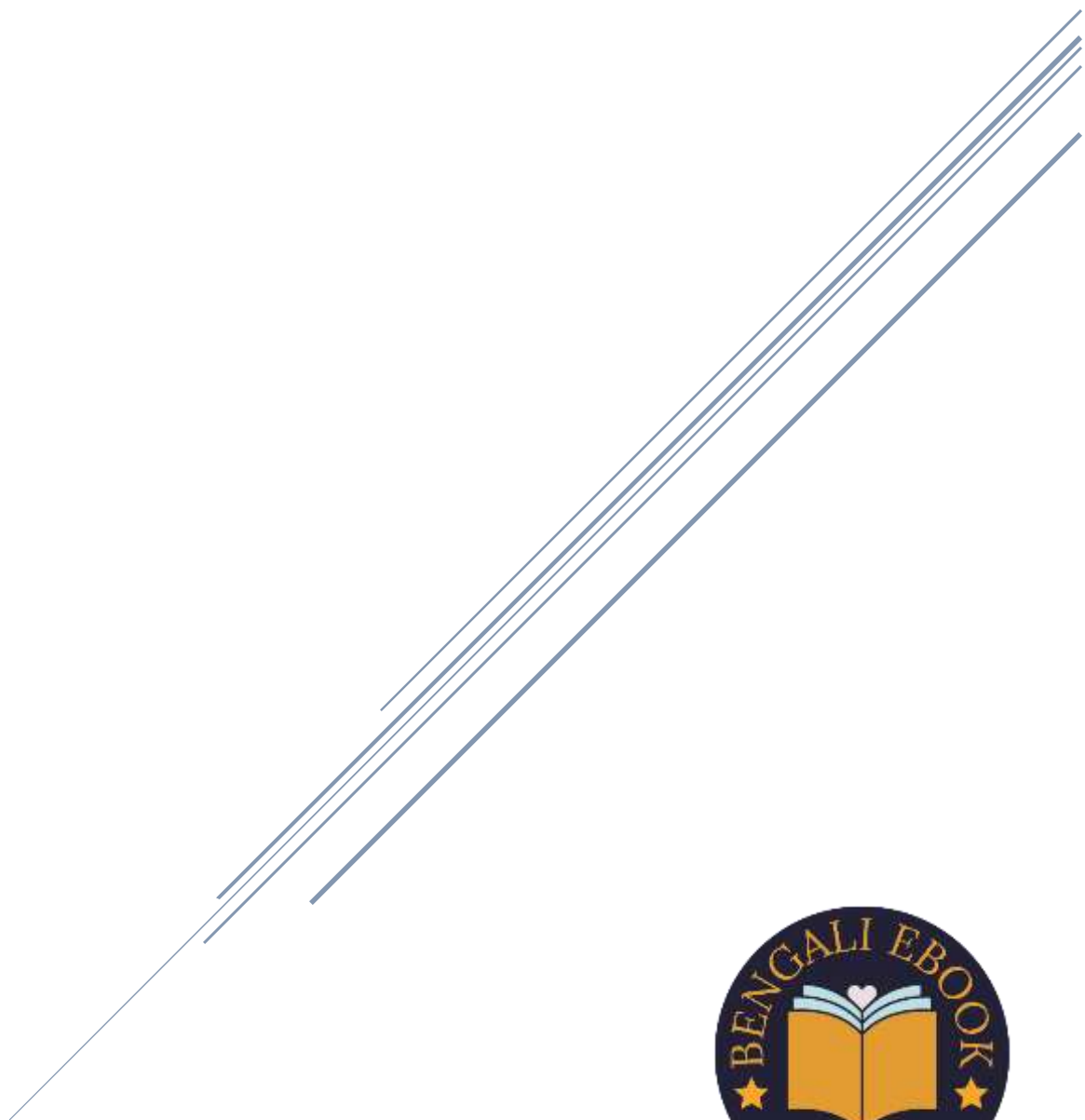


অপ্রচলিত গল্প

সুকান্ত ভট্টাচার্য



সূচিপত্র

কিশোরের স্বপ্ন.....	2
ক্ষুধা.....	6
দরদী কিশোর.....	17
দুর্বোধ্য.....	20
ভদ্রলোক.....	24

কিশোরের স্বপ্ন

রবিবার দুপুরে রিলিফ কিচেনের কাজ সেরে ক্লান্ত হয়ে জয়দ্রথ বাড়ি ফিরে ‘বাংলার কিশোর আন্দোলন’ বইটা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ল, পড়তে পড়তে ক্রমশ বইয়ের অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে এল, আর সে ঘুমের সমুদ্রে ডুবে গেল।

চারিদিকে বিপুল-ভীষণ অন্ধকার। সে-অন্ধকারে তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, কিন্তু তা বেশীক্ষণ নয়, একটু পরেই জ্বলে উঠল। সহস্র সহস্র শিখায় এক বিরাট চিতা; আর শোনা গেল লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের আতর্নাদ-ভয়ে জয়দ্রথের হাত পা হিম হয়ে যাবার উপক্রম হতেই সে পিছনের দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল-অসহ্য সে আতর্নাদ; আর সেই চিতার আগুনে তার নিজের হাত পা-ও আর একটু হলে ঝলসে যাচ্ছিল।

আবার অন্ধকার। চারিদিকে মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতা। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কে যেন তার পিঠে একটি শীর্ণ, শীতল হাত রাখল। জয়দ্রথ চমকে উঠল : ‘কে?’

তার সামনে দাঁড়িয়ে সারা দেহ শতচ্ছিন্ন কালো কাপড়ে ঢাকা একটি মেয়ে-মূর্তি। মেয়েটি একটু কেঁপে উঠল, তারপর ক্ষীণ, কাতর স্বরে গোঙাতে গোঙাতে বলল : আমাকে চিনতে পারছ না? তা পারবে কেন, আমার কি আর সেদিন আছে? তুমি আমার ছেলে হয়েও তাই আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না...দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে; আমি তোমার দেশ!...

বিস্ময়ে জয় আর একটু হলে মূর্ছা যেত : ‘তুমি?’

—হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না? ম্লান হাসে বাংলা দেশ।

—তোমার এ অবস্থা কেন?

জয়ের দরদ মাখান কথায় ডুকরে কেঁদে উঠল বাংলা।

–খেতে পাই না বাবা, খেতে পাই না...

–কেন, সরকার কি তোমায় কিছু খেতে দেয় না?

বাংলার এত দুঃখেও হাসি পেল : কোন দিন সে দিয়েছে খেতে? আমাকে খেতে দেওয়া তো তার ইচ্ছা নয়, চিরকাল না খাইয়েই রেখেছে আমাকে; আমি যাতে খেতে না পাই, তার বাঁধনের হাত থেকে মুক্তি না পাই, সেজন্যে সে আমার ছেলেদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়ে তাকে টিকিয়েই রেখেছে। আজ যখন আমার এত কষ্ট, তখনও আমার উপযুক্ত ছেলেদের আমার মুখে এক ফোটা জল দেবারও ব্যবস্থা না রেখে আটকে রেখেছে-তাই সরকারের কথা জিজ্ঞাসা করে আমায় কষ্ট দিও না...

জয় কিছুক্ষণ চুপ ক’রে সেই কাপড়ে ঢাকা রহস্যময়ী মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বলে : তোমার ঘোমটা-টা একটু খুলবে? তোমায় আমি দেখব।

বাংলা তার ঘোমটা খুলতেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ক’রে উঠল জয় : উঃ, কী ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তোমার। আচ্ছা তোমার দিকে চাইবার মতো কেউ নেই দেশের মধ্যে?

–না, বাবা। সুসন্তান ব’লে, আমার মুখে দুটি অন্ন দেবে ব’লে যাদের ওপর ভরসা করেছিলুম, সেই ছেলেরা আমার দিকে তাকায় না, কেবল মন্ত্রী হওয়া নিয়ে দিনরাত ঝগড়া করে, আমি যে এদিকে মরে যাচ্ছি, সেদিকে নজর নেই, চিতার ওপর বোধহয় ওরা মন্ত্রীর সিংহাসন পাতবে...

–তোমাকে বাঁচাবার কোনো উপায় নেই?

–আছে। তোমরা যদি সরকারের ওপর ভরসা না করে, নিজেরাই একজোট হয়ে আমাকে খাওয়াবার ভার নাও, তা হলেই আমি বাঁচব...

হঠাৎ জয় ব’লে উঠল : তোমার মুখে ওগুলো কিসের দাগ?

—এগুলো? কতকগুলো বিদেশী শত্রুর চর বছর খানেক ধরে লুটপাট ক’রে, রেল-লাইন তুলে, ইস্কুল-কলেজ পুড়িয়ে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করছিল, এ তারই দাগ। তারা প্রথম প্রথম টআমার’ ভাল হবে বলে আমার নিজের ছেলেদেরও দলে টেনেছিল, কিন্তু তারা প্রায় সবাই তাদের ভুল বুঝেছে, তাই এখন ক্রমশ আমার ঘা শুকিয়ে আসছে। তোমরা খুব সাবধান!...এদের চিনে রাখ; আর কখনো এদের ফাঁদে পা দিও না। আমাকে খুন করতে...

জয় আর একবার বাংলার দিকে ভাল ক’রে তাকায়, ঠিক যেন কলকাতার মরো মরো ভিখারীর মতো চেহারা হয়েছে। হঠাৎ পায়ের দিকে তাকিয়েই সে চীৎকার ক’রে ওঠে : এ কী?

দেখে পা দিয়ে অনর্গল রক্ত পড়ছে।

—তোমার এ অবস্থা কে করলে?

হঠাৎ বাংলার ক্লান্ত চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, বললে :-জাপান।...খিদের হাত থেকে যদিও বা বাঁচতুম, কিন্তু এর হাত থেকে বোধহয় বাঁচতে পারব না...

জয় বুক ফুলিয়ে বলে : আমরা, ছোটরা থাকতে তোমার ভয় কী?

‘—পারবে? পারবে আমাকে বাঁচাতে?’ বাংলা দুর্বল হাতে জয়কে কোলে তুলে নিল।

বাংলার কোলে উঠে জয় আবেগে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

—তুমি কিছু ভেব না। বড়রা কিছু না করে তো আমরা আছি।

বাংলা বলে : তুমি যদি আমাকে বাচাতে চাও, তা হলে তোমায় সাহায্য করবে, তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে, তোমার মজুর কিষাণ ভাইরা। তারা আমায় তোমার মতোই বাঁচাতে চায়, তোমার মতোই ভালবাসে। আমার

কিষণ ছেলেরা আমার মুখে দুটি অন্ন দেবার জন্যে দিনরাত কী পরিশ্রমই না করেছে; আর মজুর ছেলেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে আমার কাপড় যোগাবার জন্যে।

জয় বলে : আর আমরা? তোমার ছোট্ট দুষ্ট ছেলেরা?

বাংলা হাসল, ‘তোমরাও পাড়ায় পাড়ায় তোমাদের ছোট্ট হাত দিয়ে আমায় খাওয়ানোর চেষ্টা করছ।’

জয় আনন্দে বাংলার বুকে মুখ লুকোয়। হঠাৎ আকাশ-কাঁপা ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। বাংলার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ভয় ফুটে উঠল।

‘—ঐ, ঐ তারা আসছে...সাবধান! শত্রুকে ক্ষমা ক’রো না-তা হলে আমি বাঁচব না।’ জয় তার ছোট্ট দু’হাত দিয়ে বাংলাকে জড়িয়ে ধরল। কী যেন বলতে গেল সে, হঠাৎ শুনতে পেল তার দিদি তিস্তা তাকে ডাকছে :

—ওরে জয়, ওঠ, ওঠ, চারটে বেজে গেছে। তোর কিশোরবাহিনীর বন্ধুরা, তোর জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

জয় চোখ মেলে দেখে ‘বাংলার কিশোর আন্দোলন’ বইটা তখনো সে শক্তি ক’রে ধরে আছে।

[কিশোরের স্বপ্ন’ গল্পটি জনযুদ্ধের কিশোর বিভাগে ৬ই অক্টোবর ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। জনযুদ্ধের প্রকাশিত গল্প দুটি শ্রীসুধী প্রধানের সহায়তায় সংগৃহীত।]

ক্ষুধা

দুপুরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল; আর ভঙ্গ হল কালো মিত্তিরের বহু সাধনালব্ধ ঘুম। বাইরে মোক্ষদা মাসির ক্ষুরধার কণ্ঠস্বর এক মুহুর্তে সমস্ত বস্তিকে উচ্চকিত করে তুলল, কাউকে করল বিরক্ত আর কাউকে করল। উৎকর্ণ; তবু সবাই বুঝল একটা কিছু ঘটেছে। মাসির গর্জন শুনে নীলু ঘোষের পাঁচ বছরের ছেলে তিনু কান্না জুড়ে দিল, আর তার মা যশোদা তাকে চুপ করাবার জন্যে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং সন্তর্পণে কান পেতে রইল মাসির স্বর-সন্ধানের প্রতি। সকলের মধ্যেই একাগ্র হয়ে রইল আগ্রহ ও উত্তেজনা, কিন্তু কেউ ব্যস্ত নয়। কোনো প্রশ্নই কেউ করল না। করতে হয়ও না। কারণ সবাই জানে মাসি একাই একশো— এবং এই একশো জনের প্রচারবিভাগ আজ পর্যন্ত কারো প্রশ্নের প্রত্যাশা বা অপেক্ষা করে নি। মাসি এক নিঃশ্বাসে এক ঘটি জল নিঃশেষ ক’রে শুরু করল :

—ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো কণ্টোরালির মুখে। মরণ হয় না রে তোদের? পয়সা দিয়ে চাল নেব, অত কথা শুনতে হবে কেন শুনি? আমরা কি তোদের খাস।তালুকের পেরাজা? আগুন লেগে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে চালের গুদোম রে। দু’মুঠো চালের জন্যে আমার মানসন্তোম সব গেল গো! আবার টিকিট ক’রেছেন, টিকিট; বলি ও টিকিটের কী দাম আছে শুনি?—লক্ষ্মী পিসিকে সম্মুখবর্তী দেখে মাসির স্বর সপ্তমে উঠল। :-ও টিকিটে কিছু হবে না গো, কিছু হবে না। সোমাত্ত বয়েস, সুন্দর মুখ না হলে কি চাল পাবার যে আছে? আমি হেন মানুষ ভোর থেকে বসে আছি টিকিট আঁকড়ে তিন প’র বেলা পর্যন্ত, আর আমাকে চাল না দিয়ে চাল দিলে কিনা ও বাড়ির মায়া সুন্দরীকে। কেন? তোর সাথে কি মায়ার পিরীত চলছে নাকি? (তোরপর একটা অশ্লীল মন্তব্য)।...

বিনয় এতক্ষণ মাসির বাক্যঝড়কে একরকম উপেক্ষা করেই লিখে চলছিল, কিন্তু মায়ার নাম এবং সেই সঙ্গে ওর। প্রতি একটা ইত্যর উক্তি শুনে তার কলম তার অজ্ঞাতসারেই শ্লথ এবং মন্থর হয়ে এল। সে একটু আশ্চর্য হল। সে-আশ্চর্যবোধ মাসির চাল না পাওয়ার জন্যে নয়; বরং এতে

সবচেয়ে আশ্চর্য না হওয়ারই কথা, কারণ এ একটা দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু সে আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, মায়া কিনা শেষ পর্যন্ত চাল আনতে গেছিল।

বিনয় হয়তো ভাবতে পারল চাল না পাওয়া একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু মাসির কাছে এ একেবারে নতুন ও অপ্রত্যাশিত; কারণ এতদিন পর্যন্ত সে নির্বিবাদে ও নিরঙ্কুশ ভাবে চাল পেয়ে এসেছে এবং আজই তার প্রথম ব্যতিক্রম বলেই সে এতটা মর্মান্বিত। অন্যান্য দিন যারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে মাসির কাছে দুঃখ জানিয়েছে, মুখে তাদের কাছে সমবেদন জ্ঞাপন করলেও মনে মনে মাসি এদের অকৃতকার্যতায় হোসেছে; কিন্তু আজ মাসি ব্যর্থতার দুঃখ অনুভব করলেও যারা তারই মতো ব্যর্থ হয়েছে তাদের প্রতি তার সহানুভূতি দূরে থাক উপরন্তু রাগ দেখা দিল। তাই লক্ষ্মী পিসির উদ্দেশ্যে সে বলল :

-তুই চাল পেলি না কেন রে পোড়ারমুখী?

লক্ষ্মী পিসি মাসির চেয়ে বয়সে ছোট এবং তার প্রতাপে জড়োসড়োও বটে, তাই সে জবাব দিল : কী করব, বল?

মাসি দাঁত খিঁচিয়ে উঠল এবং তারপর কণ্ট্রোলের শাপান্ত এবং বাপান্ত করতে করতে দুপুরটা নষ্ট করতে উদ্যত দেখে বিনয় ঘরে তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। বিনয় এ. আর. পি. সুতরাং সকলের অবজ্ঞায় এবং গভর্ণমেন্টের পোষ্য জীব বলে উপহাসিত। প্রধানত সেই কারণে, আর তা ছাড়া বিনয়ের রহস্যজনক চলাফেরায় সকলে বিনয়কে এড়িয়ে চলে এবং বিনয় সকলকে এড়িয়ে যায়। কাজেই বিনয়কে বেরোতে দেখে সমবেত নারীমণ্ডলী অর্থাৎ মোক্ষদা, লক্ষ্মী, যশোদা, আশার মা, পুট, রেণু, হারু ঘোষ এবং ননী দত্তের স্ত্রী প্রভৃতি চঞ্চল হয়ে ঘোমটা টেনে স'রে গেল। তারপর আবার যথারীতি ক্ষুধিত, বঞ্চিত এবং উৎপীড়িত নারীদের সভা চলতে লাগল।

কেউ কণ্ট্রোলের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে, কেউ সিভিকগার্ডের অত্যাচারের সম্বন্ধে, কেউ গভর্ণমেন্টের অবিচার সম্বন্ধে উঁচু-নীচু গলায় আলোচনা করতে লাগল। মাসি এ-সভার প্রধান বক্তা, যেহেতু সে সদ্যব্যর্থ এবং সর্বাপেক্ষা আহত, সর্বোপরি তার কণ্ঠস্বরই বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ এবং মার্জিত। ক্রমে আলোচনা কণ্ট্রোল থেকে মায়-বিনয়ের সম্পর্ক এবং তা থেকে ক্রমশ চুরি-ডাকাতির উপদ্রবে পর্যবসিত হল দেখে যশোদা তার কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে ঘরে ঢুকল, আর তার পেছনে পেছনে তিনু ‘মা খেতে দিবি না?’ ‘কখন ভাত রাধবি?’ ইত্যাদি বলতে বলতে যশোদার আঁচল ধরে টানতে থাকল। আর তার ছোট ছোট মুঠির অজস্র আঘাতে মাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো; নীলু ঘোষ আজও কন্টোল থেকে চাল পায় নি, তাই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ঘরে ফিরেছিল, কিন্তু তিমুর অবিরাম কান্না তাকে বাধ্য করল আর কোথাও চাল পাওয়া যায় কিনা সন্ধান করে দেখতে। তাই সে গামছা হাতে বেরিয়ে পড়ল দূরের কোনো কণ্ট্রোল দোকানের উদ্দেশ্যে। আর ঘরের মধ্যে যশোদা ক্ষুধার্ত সন্তানের হাতে নিপীড়িত হতে লাগল। যশোদা এবং নীলু আজ দু’দিন উপবাসী। নীলু ঘোষ একটা প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ করত, মাইনে ছিল পনেরো টাকা। যদিও একমণ চালের দাম কুড়ি টাকা, তবুও নীলু ঘোষ কণ্ট্রোল দোকানের উপর নির্ভর করে চালাতে পারত, যদি চালের প্রত্যাশায় কণ্ট্রোল দোকানে ধর্ণা দিয়ে পর পর কয়েক দিন দেরি ক’রে তার চাকরীটা না যেত। আজ মাসখানেক হল নীলু ঘোষের চাকরী নেই, কিন্তু এতদিন যে সে না-খেয়ে আছে এমন নয়, তবে সম্প্রতি আর চলছে না, আর সেইজন্যেই সে এবং যশোদা দু’দিন ধরে অনশনে কাটাচ্ছে। যশোদার যা কিছু গোপন সম্বল ছিল তাই দিয়ে গত দু’দিন সে তিমুর ক্ষুধাকে শান্ত করেছে আর কোলের ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বুকুর পানীয় দিয়ে। কিন্তু আজ? আজ তার সম্বল ফুরিয়েছে, বক্ষস্থিত পানীয় নিঃশেষিত; আর নিজে সে তীব্র বুভুক্ষায় শীর্ণ এবং দুর্বল। অনশন ক’রে সে নিজের প্রতিই যে শুধু অবিচার করেছে, তা নয়, অবিচার করেছে আর একজনের প্রতিসে আছে তার দেহে, সে পুষ্ট হচ্ছে তার রক্তে, সে প্রতীক্ষা করছে এই আলো-বাতাসময় পৃথিবীর মুক্তির। তার প্রতি যশোদার দায়িত্ব কি পালিত হল? ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় সে চোখ বুজিলো, কোলের শিশুটিকে নিবিড় করে চেপে ধরল আতঙ্কিত বুকো। যশোদা

ভেবে পায় না কী প্রয়োজন এই আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়ে ভীত পৃথিবীতে একটি নতুন শিশুর জন্ম নেবার? অথচ তার আত্মপ্রকাশের দিন নিকটবর্তী।

হারু ঘোষ নীলুর অগ্রজ এবং সে এই বাড়িতেই পৃথক ভাবে থাকে, চাকরী করে চটকলে, মাইনে পঁচিশ টাকা। নীলুর কাছে সে অবস্থাপন্ন, তাই নীলু। তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে এবং সম্বোধন করে ‘বড়লোক’ বলে। দিন সাতেক আগে তিনুর কাছে ঠিক এই রকম উৎপীড়িত হয়ে যশোদা তার সঙ্গতি থেকে একসের চাল কেনবার মতো পয়সা নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছিল কট্রোল্ড দোকানের দিকে। এই প্রথম সে একাকী পথে বেরুল। লজ্জায়, সংকোচে, অনভ্যাসের জড়তায় শোচনীয় হয়ে উঠল তার অবস্থা। সে আরো সংকটাপন্ন হল যখন কোলের শিশুটি রাস্তার মাঝখানে চীৎকার ক’রে কেঁদে উঠল। তবু সে ঘোমটার অন্তরালে আত্মরক্ষা করতে করতে কণ্ট্রোল্ড দোকানে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু গিয়ে দেখল। সেখানে তার মতো ক্ষুধার্ত নারী একজন নয়, দু’জন নয়, শত-শত এবং ক্ষুধার তাড়নায় তাদের লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, আব্রু নেই, সংযম নেই, নেই কোন কিছুই; শুধু আছে ক্ষুধা আর আছে সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির আদিম প্রবৃত্তি। যার কিছু নেই সেও আহাৰ্য চায়, তারো বাঁচবার অদম্য লিপ্সা। সবকিছু দেখেশুনে যশোদা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চেষ্টা করেছিল শিশুটাকে শান্ত করবার আর ডাকছিল সেই ভগবানকে যে-ভগবান অন্তত একসের চাল তাকে দিতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে ভগবানের বদলে উপস্থিত হল হারু ঘোষ। সে কারখানায় ধর্মঘট ক’রে বাড়ি ফিরছিল, এমন সময় পথের মধ্যে ভ্রাতৃবধূকে ঐ অবস্থায় দেখে কেমন যেন বেদনা বোধ করল। খানিকক্ষণ চুপ ক’রে থেকে যশোদার কাছে গিয়ে ডাকল : বৌমা, এসো। ঠিক এই রকম দুরবস্থার মধ্যে সহসা ভাঙুরের হাতে ধরা পড়ে যশোদার অবস্থা হল অবর্ণনীয়। তার ইচ্ছা হল সীতার মতো ভূগর্ভে মিলিয়ে যেতে অথবা সতীর মতো দেহত্যাগ করতে। কিন্তু তা যখন হল না। তখন বাধ্য হয়ে ফিরতে হল হারু ঘোষের পেছনে পেছনে।

ঘরে ফিরে হারু ঘোষ স্ত্রীর কাছ থেকে একসের চাল নিয়ে যশোদাকে দিল। বলল : নীলুকে বলো, পুরুষ মানুষ হয়ে যে বৌ-বেটাকে খেতে দিতে পারে না তার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

সারাদিন ঘোরাঘুরি ক'রে চাকরী অথবা চাল কোনটাই যোগাড় করতে না পেরে নীলু ঘোষ নিরাশ এবং সন্তুষ্ট মনে বাড়ি ফিরল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে-পথে পথে নিরন্ধ অন্ধকার। স্যাঁৎসেঁতে গলিটার মধ্যে প্রবেশ করতেই মূর্তিময় আতঙ্ক যেন তাকে ঠাণ্ডা হাত দিয়ে স্পর্শ করল। নীলু ঘোষ এক মুহূর্ত থামল, কী যেন ভাবল, তারপর নিঃশব্দে অগ্রসর হল। চুপি চুপি ঘরে ঢুকে সে যা দেখল তাতে সে অবাক হল না, এবং এটাই সে আশা করেছিল। যশোদা তিনুকে ভাত খাওয়াচ্ছে। নীলু নিজের বুদ্ধিকে তারিফ করল। ভাগ্যিস সে চুপি চুপি ঘরে ঢুকেছিল, তাই এমন গোপন ব্যাপারটা সে জানতে পারল। তা হলে এই ব্যাপার? এরা জমানো চাল লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে, আর সে কিনা সারাদিন না খেয়ে ঘুরছে? সে আড়াল থেকে অনেকক্ষণ লঠনের আলোয় যশোদার ভালমানুষের মতো মুখখানা দেখল, আর রাগে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে একটি লাথিতে তাকে ধরাশায়ী করতে। কিন্তু সেজিঘাংসা অতি কষ্টে সে দমন করল; কারণ সে জানে, তারই একজন অদৃশ্য সন্তান যশোদার দেহকে আশ্রয় করে আছে।

নীলু। ঘরে ঢুকল। নীলুকে দেখে যশোদা তিনুকে আঁচিয়ে নীলুর জন্যে জায়গা করে ভাত বাড়তে বসল। যশোদাকে ধরা পড়ে। এই ভালমানুষী করতে দেখে প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও নীলুর হাসি পেল। কিন্তু তবুও সে খেতে বসল, কারণ খাওয়া তার দরকার। ভাতে হাত দিয়েই সে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল; এ-চাল ছিল কোথায়?

যশোদা সংক্ষেপে উত্তর দিল : আজকে বিকেলে তোমার দাদা দিয়েছেন।

মুহূর্তে সব ওলট-পালট হয়ে গেল নীলুর মধ্যে। কিছুক্ষণ যশোদার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল : দিয়ে কী বললে? কতদিনের জন্যে চালটা ধার দিল সে-সম্বন্ধে কিছু বলেছে কী?

অতর্কিতে যশোদার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল : না, সে সম্বন্ধে কিছু বলে নি। শুধু বলেছে, যে-পুরুষমানুষ বৌ-বেটাকে খেতে দিতে পারে না তার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

যে-কথাটা যশোদা এতক্ষণ ধরে বলবে না বলে ভেবে রেখেছিল সেই কথাটা অসাবধানে বলে ফেলেই সে বিপুল আশঙ্কায় নীলুর মুখের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে নীলু হুংকার দিয়ে উঠল :

-কী, আমাকে যে এতবড় অপমান করল তার দেওয়া চাল তুই আমাকে খাওয়াতে বসেছিস, হতভাগী? কে বলেছিল তোকে ঐ বড়লোকের দেওয়া চাল আনতে, এ্যাঁ? তুই আমার বৌ হয়ে কিনা ওর কাছে ভিক্ষে করতে গেছিলি? হারামজাদী, খা, তোর ভিক্ষে করে আন চাল তুই খা-

বলেই ভাতের থালাটা পদাঘাতে দূরে সরিয়ে নীলু ঘোষ হাত ধুয়ে ঘরে এসে যশোদাকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চললো :

-বেরো পোড়ারমুখী, বেরো আমার ঘর থেকে, তোকে পাশে ঠাই দিতেও আমার ঘেন্না করে। যা, তোর পেয়ারের লোকের কাছে শুগে যা-তোর মুখ দেখতে চাই না।

নীলু যশোদাকে বের করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আর যশোদা অত্যন্ত সাবধানে এবং নীরবে এইটুকু সহ্য করল। বারান্দায় ভিজে মাটির ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশের অজস্র তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যশোদার চোখ জলে ভরে এল, ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল। আর হারু ঘোষ ঘরে শুয়ে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল; কারণ অপরাধ তো তারই, সেই তো ওদের কষ্টে ব্যথিত হয়ে এই কাণ্ডটা ঘটাল।

তার পরদিনই কোথা থেকে যেন নীলু। পাঁচ সের চাল নিয়ে এল। সেই চালে ক'দিন চলার পর দু'দিন হল ফুরিয়ে গেছে, তাই দু'দিন ধরে যশোদা অনাহারে আছে। এ ক'দিন সবই হয়েছে, কেবল নীলু এবং যশোদার মধ্যে কোনো কথোপকথন হয় নি। শুধু নীলু মাঝে মাঝে চুপি চুপি তিনুকে ডেকে

জিজ্ঞাসা করেছে: হ্যাঁ রে খোকা, তোর মা ভাত খেয়েছে তো রে? অজ্ঞ তিনু খুশিমত কখনো ‘হ্যাঁ’ বলেছে, কখনো ‘না’ বলেছে।

কাল নীলু পরিমিত পয়সা নিয়ে গিয়েও কণ্ট্রোল্ড দোকান থেকে বেলা হয়ে যাওয়ার জন্যে চাল না নিয়ে ফিরে এসেছিল। নীলুর ওপর যশোদার এজন্যে রাগই হয়েছিল, কিন্তু আজ মোক্ষদা মাসির কাছ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে তিনুর অজস্র মুষ্টিবর্ষণকে অগ্রাহ করে সে ভাবতে লাগল, দোষ নীলুর নয়, তার ভাগ্যের নয়, দোষ মুষ্টিমেয় লোকের, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে অথচ ক্ষমতার সদ্যবহার করে না তাদের।

এদিকে হারু ঘোষের মিলের কর্তৃপক্ষ তাদের দাবী না মানায় হারুর জীবনযাত্রাও কষ্টকর হয়েছে। তার চাল ফুরিয়ে গেছে চার পাঁচ দিন হল। রোজ এর-ওর কাছ থেকে ধার করে চলছে, তাকেও কণ্ট্রোল্ড দোকানের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। আজ প্রভাত হবার আগে হারু এবং নীলু উভয়েই বেরিয়ে পড়েছিল, উভয়ের ঘরেই চাল নেই। উভয়েই তাই কণ্টোল্ড দোকানের লাইনের প্রথমে দাঁড়বার জন্যে গিয়ে দেখে, তারা প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে। তার আগেই বহু লোক সমবেত।

কাল পর্যন্ত যা ছিল সম্বল তাই দিয়েই যশোদা তিনুকে ক্ষুধার জ্বালা থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আজ যখন ক্ষুধার জ্বালায় তিনু মাকে মারা ছেড়ে দিয়ে মাটি খেতে শুরু করল তখন আর সহ্য হল ন যশোদার। তিনুকে কোলে নিয়ে ছুটে গেল হারু ঘোষের স্ত্রীর কাছে, গিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল :

—দিদি আমার ছেলেকে বাঁচাও, দু’মুঠো চাল দিয়ে রক্ষা কর একে, তোমার তো ছেলেমেয়ে নেই, তুমি তো ইচ্ছা করলে আর একবেলা না খেয়ে থাকতে পার, কিন্তু এর শিশুরা প্রাণ আর সইতে পারছে না দিদি। দিদি, এর মুখের দিকে একবার তাকাও। তোমার শ্বশুরকুলের প্রদীপটিকে নিভতে দিও না।

বলেই যশোদা তার দিদির পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তিনুও তার মা'র কাণ্ড দেখে কান্না ভুলে গেল। যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করার পরও দিদির নারী সুলভ হৃদয় উদ্ধৃতি তণ্ডুলাংশটুকু না দিয়ে পারল না।

সেইদিন রাত্রে। সমস্ত দিন হাঁটাহাঁটি করেও ভ্রাতৃত্ব চাল অথবা পয়সা কিছুই যোগাড় করতে না পেরে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়িতে ফিরল। বাড়িতে ঢুকে নীলু ঘোষ সব চুপচাপ দেখে বারান্দায় বসে বিড়ি টানছিল, এমন সময় হারু ঘোষের প্রবেশ। বাড়িতে পদার্পণ করেই এই ঘটনা শুনে ক্ষুণ্ণ হারু ঘোষ স্ত্রীর নিবুদ্ধিতায় জ্বলে উঠল :

-কে বলেছিল ওদের দয়া করতে? ওদের ছেলে মারা গেলে আমাদের কী? নিজেরাই খেতে পায় না, তায় আবার দান-খয়রাত, ওদের চাল দেওয়ার চেয়ে বেড়াল-কুকুরকে চাল দেওয়া ঢের ভাল, ওই বেইমান নেমক-হারামের বৌকে আবার চাল দেওয়া! ও আমার ভাই! ভাই না শততুর। চাল কি সস্তা হয়েছে, না, বেশী হয়েছে যে তুমি আমায় না বলে চাল দাও!

সঙ্গে সঙ্গে হারু ঘোষের ফুলিঙ্গ নীলু ঘোষের বারুদে সঞ্চারিত হল। মুখের বিড়িটা ফেলে বিদ্যুদ্বোগে উঠে দাঁড়াল নীলু ঘোষ। চকিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে চীৎকার করে উঠল- কী, আবার? বড্ড খিদে তোর, না? দাঁড়া তোর খিদে ঘুচিয়ে দিচ্ছি... বলেই প্রচণ্ড এক লাথি। বিকট আর্তনাদ করে যশোদা লুটিয়ে পড়ল। নীলু ঘোষের পায়ে ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল হারু ঘোষ, মোক্ষদা মাসি, লক্ষ্মী পিসি, হারুর স্ত্রী, আশার মা, পুট, রেণু, কালো মিত্তির, বিনয়, মায়া ইত্যাদি সকলে। ডাক্তার, আলো, পাখা, জল, এ্যাম্বুলেন্স, টেলিফোন প্রভৃতি, লোকজন শব্দকোলাহল নীলুকে কেমন যেন আচ্ছন্ন এবং বিমূঢ় করে ফেলল। সে স্তব্ধ হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। যশোদাকে কখন যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল নীলুর অচেতন্য মনের পটভূমিতে তার চিহ্ন রইল না। ঘর ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর নীলুর মন কেমন যেন শূন্যতায় ভরে গেল, আন্তে আন্তে মনে পড়ল একটু আগের ঘটনা। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। যশোদার পরিত্যক্ত জীর্ণ বিছানায়, যশোদার চুলের গন্ধময় বালিশটাকে আঁকড়ে ধরল সজোরে। সব চুপচাপ। শুধু তার হৃৎপিণ্ডের

দ্রুততালে ধ্বনিত হতে থাকল বুভুক্ষুর ছন্দ আর আসন্ন মৃত্যুর দ্রুততর পদধ্বনি। সমস্ত আশা এবং সমস্ত অবলম্বন আজ দারিদ্র্য ও অনশনের বলিষ্ঠ দুই পায়ে দলিত, নিঃশেষিত। ...সুতরাং? অন্ধকারে নীলু ঘোষের দু'চোখ একবার স্বাপদের মতো জ্বলে উঠে নিভে গেল; আকাশে শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন-প্রহরী বিমানের নৈশ পরিক্রম।

আর হারু ঘোষ? শ্রান্ত, অবসন্ন হারু ঘোষের মনেও দেখা দিয়েছে বিপর্যয়! ক্ষুধিত হারু ঘোষ অন্ধকারে নিশাচরের মতো নিঃশব্দ পদচারণায় সারা উঠোনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেওয়ালে নিজের ছায়া দেখে থমকে দাঁড়ায় – তারপর আবার ঘুরতে থাকে। একে একে প্রত্যেক ঘরের আলো নিভে যায়, অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে, রাত গভীরতর হয়, তবু হারু ঘোষের পদচারণার বিরাম নেই। অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে হারু ঘোষ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীরে অনুভব করতে থাকে কিসের যেন অশরীরী আবির্ভাব। অত্যন্ত ভীত, অত্যন্ত অসহায় ভাবে তাকায় আকাশের দিকে, সেখানে লক্ষ লক্ষ চোখে আকাশ ভৎসনা জানায়-ক্ষমা নেই। হারু ঘোষ উন্মাদ হয়ে উঠল -আকাশ বলে ক্ষমা নেই, দেওয়ালের ছায়া বলে ক্ষমা নেই, তার হৃদস্পন্দন দ্রুতস্বরে ঘোষণা করতে থাকে ক্ষমা নেই। তার কানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্বরে ধ্বনিত হতে থাকে-ক্ষমা নেই।...

ভোরের দিকে মোক্ষদা মাসি ফিরে এল হাসপাতাল থেকে। অত্যন্ত সন্তর্পণে ফিস ফিস করে হারু ঘোষ জিজ্ঞাসা করল— কী খবর?

মোক্ষদা মাসির মতো মুখরাও মূক, মুহ্যমান-দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে জানালে, বেঁচে নেই। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল তার ঘরের দিকে।

হারু ঘোষের সারা দেহে চাবুকের মতো চমকে উঠল আর্তনাদ; শরীর-মন এক সঙ্গে টলে উঠল, সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে বয়ে গেল অগ্নিময় প্লাবন। রাত শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। পাণ্ডুর আকাশের দিকে তাকিয়ে হারু ঘোষ নিজেও এবার অনুভব করল : ক্ষমা নেই।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই বিনয় সবিষ্ময়ে চেয়ে দেখে, মায়া অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাকে ডাকছে। বেশ বেলা যে হয়ে গেছে চারিদিকের তীব্র রোদ্দুর তারই বিজ্ঞাপন। কালকের দুর্ঘটনার জন্যে তার ঘুম আসতে বেশ দেৱী হয়েছিল, সুতরাং বেলায় যে ঘুম ভাঙবে এটা জানা কথা, কিন্তু সেজন্যে মায়ার এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই; তবু একটা ‘কারণ’ মনে মনে সন্দেহ করে বিনয় পুলকিত হল। মৃদু হেসে বলল : দাঁড়াও, উঠছি—তুমি যে একেবারে ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে এসেছি দেখছি।

-উঃ, কী কুঁড়ে আপনি, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি, এদিকে কী ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে তা তো জানেন না—

বিনয় কৃত্রিম গান্তীৰ্য ও বিস্ময়ের ভান করে বলল : বটে? কী রকম?

মায়া এক নিঃশ্বাসে বলে গেল : যশোদা কাকীমা কাল রাত্তিরে হাসপাতালে মারা গেছে, আর আজ সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখে, হারু কাকা, নীলু কাকা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

প্রচণ্ড বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-তাড়নায় বিনয় এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল : এ্যা! বল কি?

তারপর দ্রুত হাতে এ. আর. পি.-র নীল কোর্টা গায়ে চড়িয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অগণিত কৌতূহলী জনতা উঠোন-বারান্দা ভরিয়ে তুলেছে। পুলিশ, জমাদার, ইন্স্পেক্টরের অপ্রতিহত প্রতাপ। তারই মধ্যে দিয়ে বিনয় চেয়ে দেখল, হারু ঘোষ বারান্দায় আর নীলু ঘোষ ঘরে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষকে চিরকালের মতো ব্যঙ্গ করে বীভৎসভাবে ঝুলছে, যেন জিভ ভেঙেচাচ্ছে আসন্ন দুর্ভিক্ষকে।

বিপুল জনতা আর ঐ অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে বিনয় বস্তুি ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল, আপন মনে পথ চলতে শুরু করল, ভাবতে লাগল; দুর্ভিক্ষ যে লেগেছে তার সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত কি এই নয়? আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের লাভার মতোই তলে তলে উত্তপ্ত হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, প্রতীক্ষা করছে

বিপুল বিস্ফোরণের; সেই অনিবার্য অগুৎপাতের সূচনা দেখা গেল কাল রাত্রে। অথচ প্রত্যেকে গোপন করে চলেছে সেই অগ্নি-উদগীরণের প্রকম্পনকে আর তার সম্ভাবনাকে। আন্তে আন্তে ধ্বসে যাচ্ছে জীবনের ভিত্তি, ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে ক্ষুধার নগ্নরূপ। তবু অদ্ভুত ধৈর্য মানুষের; সমাজকে সভ্যতাকে বাঁচাবার চেষ্টাও প্রশংসনীয়।

বিনয় এক সময়ে এসে দাঁড়াল পাড়ার কণ্ট্রোল্ড দোকানের সামনে। অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল তার; দেখল, মোক্ষদা মাসি, লক্ষ্মী পিসি, মায়া সবাই সেখানে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে। বিনয় বিস্মিত হল। আর একটু আগে মোক্ষদা মাসিকে সে শোক করতে দেখে এসেছিল, অথচ নিয়তির মতো ক্ষুধা সুযোগ পর্যন্ত দিল না পরিপূর্ণ শোক করবার। মায়ার সঙ্গে চোখাচোখি হতে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল সে। অদ্ভুত ক্ষুধার মাহাত্ম্য! বিনয় ভাবতে থাকল : ক্ষুধা শোক মানে না, প্রেম মানে না, মানে না পৃথিবীর যে-কোন বিপর্যয়, সে আদিম, সে অনশ্বর।

লাইনবন্দী প্রত্যেকে প্রতীক্ষা করছে চালের জন্যে। বিনয় ভাবল, এ-প্রতীক্ষা চালের জন্যে, না বিপ্লবের জন্যে? বিনয় স্পষ্ট অনুভব করল এরা বিপ্লবকে পরিপুষ্ট করছে, অনিবার্য করে তুলছে প্রতিদিনকার ধৈর্যের মধ্যে দিয়ে। আর এদের অপরিতৃপ্ত ক্ষুধা করছে তারই পূর্ণ আয়োজন। এরা একত্র, অথচ এক নয়; এরা প্রতীক্ষমান, তবু সচেতন নয়, এরা চাইছে এতটুকু চেতনার আগুন— এদের মধ্যে আত্মগোপনকারী, ছদ্মবেশী ক্রমবর্ধমান ক্ষুধাকে প্রত্যক্ষ করে বিনয় এদের সংহত, সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করে সেই আগুন জ্বালার প্রতিজ্ঞা নিল।

[‘ক্ষুধা’ গল্পটি ২রা এপ্রিল ১৯৪৩-এর অরণি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অরুণাচলকে লেখা ২৭শে চৈত্র ১৩৪৯ তারিখের চিঠিতে এই গল্পটির উল্লেখ করেছেন সুকান্ত।]

দরদী কিশোর

দোতলার ঘরে পড়ার সময় শতদ্রু আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। জানলা দিয়ে সে দেখতে পায় তাদের বাড়ির সামনের বস্তিটার জন্যে যে নতুন কট্রোলের দোকান হয়েছে, সেখানে নিদারুণ ভীড়, আর চালের জন্যে মারামারি কাটাকাটি। মাঝে মাঝে রক্তপাত আর মূর্ছিত হওয়ার খবরও পাওয়া যায়। সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে স্কুলের পড়া ভুলে যায়, অন্যায় অত্যাচার দেখে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, তবু সে নিরুপায়, বাড়ির কঠোর শাসন আর সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা অসম্ভব। যারা চাল না পেয়ে ফিরে যায় তাদের হতাশায় অন্ধকার মুখ তাকে যেন চাবুক মারে, এদের দুঃখ মোচনের জন্য কিছু করতে শতদ্রু উৎসুক হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনেপ্রাণে। তারই সহপাঠী শিবুকে সে পড়া ফেলে প্রতিদিন চালের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দ্যাখে। বেচারার আর স্কুলে যাওয়া হয় না, কোনো কোনো দিন চাল না। পেয়েই বাড়ি ফেরে, আর বৃদ্ধ বাপের গালিগালাজ শোনে, আবার মাঝে মাঝে মারও খায়। ওর জন্যে শতদ্রুর কষ্ট হয়। অবশেষে ঐ বস্তিটার কষ্ট ঘোচাতে শতদ্রু একদিন কৃতসংকল্প হল।

কিছুদিনের মধ্যেই শতদ্রুর সহপাঠীরা জানতে পারল শতদ্রুর পরিবর্তন হয়েছে। সে নিয়মিত খেলার মাঠে আসে না, কারুর কাছে এ্যাডভেঞ্চারের বই ধার চায় না, এমন কী ‘হাফ-হলি-ডে’তে ‘ম্যাটিনি শো’-এ সিনেমায় পর্যন্ত যায় না। একজন ছেলে, শতদ্রু দল ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে, তলে তলে খোঁজ নিয়ে জানলে শতদ্রু কী এক ‘কিশোর-বাহিনী’ গ’ড়ে তুলেছে। তারা প্রথমে খুব একচোট হাসল, তারপর শতদ্রুকে পেয়েই অনবরত খ্যাপাতে শুরু করল। কিন্তু শতদ্রু আজকাল গ্রাহ করে না, সে চুপি চুপি তার কাজ করে যেতে লাগল। বাস্তবিক, আজকাল তার মন থেকে এ্যাডভেঞ্চারের, ক্লাবের আর সিনেমার নেশা মুছে গেছে। সে আজকাল বড় হবার স্বপ্ন দেখছে। তা ছাড়া সবচেয়ে গোপন কথা, সে একজন কমুয়নিস্টের সঙ্গে মিশে অনেক কিছুই জানতে পারছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে একটা কিশোর-বাহিনীর ভলান্টিয়ার দল গ’ড়ে, বাড়ির সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ করতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে ধরা

পড়ার আশঙ্কা তাকে নিরস্ত করতে পারল না, বরং সে গোপনে কাজ করতে করতে অনুভব করল, সে-ও তো একজন দেশকর্মী। শতদ্রু ভবিষ্যৎ নেতা হবার স্বপ্নে রাঙিয়ে উঠল আর সে খুঁজতে লাগল। কঠিন কাজ, আরো কঠিন কাজ, তার যোগ্যতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। সে আজকাল আর আগের কালের ‘শতু’ নয়, সে এখন ‘কমরেড শতদ্রু রায়’। রুশ-কিশোরদের আত্মত্যাগ আর বীরত্ব শতদ্রুকে অস্থির ক’রে তোলে; সে মুখে কিছু বলে না বটে। কিন্তু মনে মনে পাগলের মতো খুঁজতে লাগল একটা কঠিন কাজ, একটা আত্মত্যাগের সুবর্ণ সুযোগ। অবশেষে সে আত্মত্যাগ করল, কিন্তু ফল হল মারাত্মক।

শতদ্রুর কাছ থেকে খবর পেয়ে ভলান্টিয়াররা শতদ্রুদের বাড়িতে উপস্থিত হল। শতদ্রুর বাবা অফিস যাবার আগে খবরের কাগজে শেয়ার মার্কেটের খবর দেখছিলেন, একপাল ছেলেকে ঢুকতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

—আমরা ‘কিশোর-বাহিনী’র ভলান্টিয়ার। আপনার ছেলের মুখে শুনলাম আপনি নাকি ষাট মণ চাল বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন, সেগুলো বস্তির জন্য দিতে হবে। আমরা অবিশ্যি আধা দরে আপনার চাল বিক্রি করে ষাট মণের দাম দিয়ে দেব। আর তাতে রাজী না হলে আমরা পুলিশের সাহায্য নিতে ভ হব না।

-আমার ছেলে, এ খবর দিয়েছে, না?

-আজ্ঞে, হ্যাঁ।

-আচ্ছা, নিয়ে যাও।

ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে চাল বের করে আনল। তারা লক্ষ্য করল না, শতদ্রুর বাবার কী জ্বলন্ত চোখ। শতদ্রুর বাবা সেদিন অফিস না গিয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

সেইদিন দুপুরে একটা আত-চিৎকার ভেসে এল বস্তির লোকদের কানে। তারা বুঝল না কিসের আতনাদ। বুঝতে পারলে হয়তো সমবেদনায় ব্যথিত হত, কিন্তু তারা সদ্য পাওয়া চাল নিয়েই ব্যস্ত রইল। বহুক্ষণ ধরে অমানুষিক অত্যাচারের পর, শতদ্রুকে তার পড়ার ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হল। কিন্তু শতদ্রু এতে এতটুকু দুঃখিত নয়, এতটুকু অনুশোচনা জাগল না তার মনে। সে ভাবল : এতো তুচ্ছ, এতো সামান্য নিপীড়ন, রুশিয়ার বীরদের অথবা কায়ুর কমরেডদের তুলনায় তার আত্মত্যাগ এমন কিছু নয়। তবু একটা কিছু করার আনন্দে সে শিউরে উঠল, আর এই কান্নায় তার মন পবিত্র শুচিন্মিষ্ক হল। জানাল দিয়ে সে চেয়ে দেখল যে-বাড়িতে আজ দুদিন উনুনে আগুন পড়েনি সেখান থেকে উঠছে ধোঁয়া; বহুদিন পরে শিবু স্কুল থেকে ফিরছে, আর কণ্ট্রোলের দোকানের লাইনে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত শৃঙ্খলা। কোথাও চাল না-পাওয়ার খবর নেই। সকলের মুখেই হাসি-যেন শতদ্রুর প্রতি অকৃপণ আশীর্বাদ। একটু পরে কান্নার বদলে শতদ্রুর কণ্ঠে গুনগুন করে উঠল ‘কিশোর-বাহিনী’র গান।

[‘দরদী কিশোর’ গল্পটি সাপ্তাহিক জনযুদ্ধ পত্রিকায় কিশোর বিভাগে ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।]

দুর্বোধ্য

সহর ছাড়িয়ে যে-রাস্তাটা রেল-স্টেশনের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার উপরে একটা তেঁতুল গাছের তলায় লোকটিকে প্রতিদিন একভাবে দেখা যায়- যেমন দেখা যেতে পাঁচ বছর আগেও। কোনো বিপর্যয়ই লোকটিকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি— যতদূর জানা যায়। এই স্থাণু বৃদ্ধ লোকটি অন্ধ, ভিক্ষাবৃত্তি তার একমাত্র জীবিকা। তার সামনে মেলা থাকে একটা কাপড়, যে কাপড়ে কিছু না কিছু মিলতই এতকাল- যদিও এখন কিছু মেলে না। লোকটি অন্ধ, সুতরাং যে তাকে এই জায়গাটা বেছে দিয়েছিল তার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়, যেহেতু এখানে জন-সমাগম হয় খুব বেশী এবং তা রেল-স্টেশনের জন্যেই। সমস্ত দিনরাত এখানে লোক-চলাচলের বিরাম নেই, আর বিরাম নেই লোকের কথা বলার। এই কথা বলা যেন জনস্রোতের বিপুল কল্লোলধ্বনি, আর সেই ধ্বনি এসে আছড়ে পড়ে অন্ধের কানের পর্দায়। লোকটি উন্মুখ হয়ে থাকে-কিছু মিলুক আর নাই মিলুক, এই কথাশোনাই তার লাভ। নিস্তব্ধতা তার কাছে ক্ষুধার চেয়েও যন্ত্রণাময়।

লোকটি সারাদিন চুপ করে বসে থাকে মূর্তিমান ধৈর্যের মতো। চিৎকার করে না, অনুযোগ করে না, উৎপীড়িত করে না কাউকে। প্রথম প্রথম, সেই বহুদিন আগে, লোকে তার নীরবতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক কিছু দিত। সন্ধ্যাবেলায় অর্থাৎ যখন তার কাছে সূর্যের তাপ আর লোকজনের কথাবার্তার অস্তিত্ব থাকত না, তখন সে বিপুল কৌতূহল আর আবেগের সঙ্গে কাপড় হাতড়ে অনুভব করত চাল, পয়সা, তরকারী...। তৃপ্তিতে তার অন্ধ দু'চোখ অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে উঠত। তারপরে সেই অন্ধকারেই একটা নরম হাত এসে তার শীর্ণ হাতটাকে চেপে ধারত- যে-হাত আনতো অনেক আশ্বাস আর অনেক রোমাঞ্চ। বৃদ্ধ তার উপার্জন গুছিয়ে নিয়ে সেই নরম হাতে আত্মসমর্পণ করে ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যেত। তারপর ভোর হবার আগেই সেই হাতেই ভর করে গাছের তলায় এসে বসত। এমনি করে কেটেছে পাঁচ বছর।

কিন্তু দুর্ভিক্ষ এল অবশেষে। লোকের আলাপ-আলোচনা আর তার মেলে-ধরা কাপড়ের শূন্যতা বৃদ্ধকে সে-খবর পৌঁছে দিল যথা সময়ে।

—কুড়ি টাকা মণ দরেও যদি কেউ আমাকে চাল দেয় তো আমি এক্ষুণি নগদ কিনতে রাজি আছি পাঁচ মণ—বুঝলে হে—

উত্তরে আর একটি লোক কি বলে তা শোনা যায় না, কারণ তারা এগিয়ে যায় অনেক দূর...

—আরে ভাবতিছ কী ভজহরি, এবার আর বৌ-বেটা নিয়ে বাঁচতি হবে না—

—তা যা বলিছ নীলমণি...

বৃদ্ধ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু আর কিছু শোনা যায় না। শুধু একটা প্রশ্ন তার মন জুড়ে ছটফট করতে থাকে—কেন, কেন? বৃদ্ধের ইচ্ছা করে একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে—কেন চালের মণ তিরিশ টাকা, কেন যাবে না বাঁচা—কিন্তু তার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কে এই অন্ধ বৃদ্ধকে বোঝাবে পৃথিবীর জটিল পরিস্থিতি? শুধু বৃদ্ধের মনকে ঘিরে নেমে আসে আশংকার কালে ছায়া। আর দুর্দিনের দুর্বোধ্যতায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে দিনের পর দিন। অজন্ম নয়—প্লাবন নয়।—তবু দুর্দিন, তবু দুর্ভিক্ষ? শিশুর মতো সে অবুঝ হয়ে ওঠে; জানতে চায় না—কেন দুর্দিন, কেন দুর্ভিক্ষ—শুধু সে চায় ক্ষুধার আহাৰ্য। কিন্তু দিনের শেষে যখন কাপড় হাতড়ে সে শুকনো গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই পায় না, তখন সারাদিনের নিস্তব্ধতা ভেঙে তার আহত অবরুদ্ধ মন বিপুল বিক্ষোভে চিৎকার করে উঠতে চায়, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে-শক্তি কোথায়? খানিক পরে সেই নরম হাতে তার অবসন্ন শিথিল হাত নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তুলে দেয়। আর ক্রমশ অন্ধকার তাদের গ্রাস করে।

একদিন বৃদ্ধের কানে এল; ফেণীতে যে আবার বোমা পড়ছে, ত্রিলোচন—

উত্তরে আর একটি লোকের গলা শোনা যায়; বল কী হে, ভাবনার কথা—

দ্বিতীয় ব্যক্তির দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও অন্ধ বৃদ্ধের মনে কোনো চাঞ্চল্য দেখা দিল না। তার কারণ সে নিৰীক নয়, সে অজ্ঞ। কিন্তু সে যখন শুনল :

—ঘনশ্যামের বৌ চাল কিনতে গিয়ে চাল না পেয়ে জলে ডুবে মরেছে, সে-
খবর শুনেছি শচীকান্ত?

তখন শচীকান্তের চেয়ে বিস্মিত হল সে। শূন্য কাপড় হাতড়ে হাতড়ে
দুর্দিনকে মর্মে মর্মে অনুভব করে বৃদ্ধ, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে
অনেক বেশী ক্লান্ত করে তোলে; প্রতিদিন।

তারপর একদিন দেখা গেল বৃদ্ধ তার নীরবতা ভঙ্গ করে ক্ষীণকাতর স্বরে
চিৎকার করে ভিক্ষা চাইছে আর সেই চিৎকার আসছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায়
বিকৃত হয়ে; সেই চিৎকারে বিরক্ত হয়ে কেউ কিছু দিল, আর কেউ বলে
গেল :

—নিজেরাই খেতে পাই না, ভিক্ষে দেব কী করে?

একজন বলল : আমরা পয়সা দিয়ে চাল পাই না, আর তুমি বিনি পয়সায়
চাল চাইছ? বেশ জোচ্চুরি ব্যবসা জুড়েছ, বাবা।

আবার কেউ বলে গেল : চাইছ। একটা পয়সা, কিন্তু মনে মনে জানো এক
পয়সা মিলবে না, কাজেই ডবল পয়সা দেবে, বেশ চালাক যা হোক।

এইসব কথা শুনতে শুনতে সেদিন কিছু পয়সা পাওয়া গেল এবং
অনেকদিন পর এই রোজগার তার মনে ভরসা আর আনন্দ এনে দিল।
কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত প্রতীক্ষার পরও সেইদিন আর সেই কোমল হাত
তার হাতে ধরা দিল না। দুর্ভাবনায় আর উৎকণ্ঠায় বহু সময় কাটার পর
অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে চমকে উঠে সে হাতড়াতে লাগল,
আর খুঁজতে লাগল একটা কোমল নির্ভরযোগ্য হাত। আন্তে আন্তে একটা
আতঙ্ক দেখা দিল অপরিসীম বেদনা ছড়িয়ে পড়ল তার মনের ফসলকাটা
মাঠে। বহুদিন পরে দেখা দিল তার অন্ধতাজনিত অন্ধমতার জন্যে
অনুশোচনা। রোরুদ্যমান মনে কেবল একটা প্রশ্ন থেকে থেকে জ্বলে
উঠতে লাগল : পাঁচ বছর আগে যে এইখানে এনে বসিয়েছে পাঁচ বছর পরে
এমন কী কারণ ঘটেছে যার জন্যে সে এখান থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে

যাবে না?—তার অনেক প্রশ্নের মতোই এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। শুধু থেকে থেকে ক্ষুধার। যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তোলে।

তারপর আরো দুদিন কেটে গেল। চিৎকার করে ভিক্ষা চাইবার ক্ষমতা আর নেই, তাই সেই পয়সাগুলো আঁকরে ধ'রে সে ধুকতে থাকল। আর দু-চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ফোটা ফোটা জল। দু-হাতে পেট চেপে ধ'রে তার সেই গোঙানী, কারো কানে পৌঁছুলো না। কারণ কারুর কাছেই এ দৃশ্য নতুন নয়। আর ভিখারীকে করুণা করাও তাদের কাছে অসম্ভব। যেহেতু দুর্ভিক্ষ কত গভীর, আর কত ব্যাপক!

বিকেলের দিকে যখন সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল অবসন্ন হয়ে, তখন একটা মিলিত আওয়াজ তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল; ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হল। তার অতি কাছে হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। : অন্ন চাই-বস্ত্র চাই...। হাজার হাজার মিলিত পদধ্বনি আর উন্মত্ত আওয়াজ তার অবসন্ন প্রাণে রোমাঞ্চ আনল অদ্ভুত উন্মাদনায় সে কেঁপে উঠল থর্থর্ করে। লোকের কথাবার্তায় বুঝল : তারা চলেছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে চাল আনতে। অন্ধ বিস্মিত হ'ল—তারই প্রাণের কথা হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—তারই নিঃশব্দ চিৎকার এদের চিৎকারে মূর্ত হচ্ছে! তা হলে এত লোক, প্রত্যেকেই তার মতো ক্ষুধার্ত, উপবাসখিন? একটা অজ্ঞাত আবেগ তার সারাদেহে বিদ্যুতের মতো চলাফেরা করতে লাগল, সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। এত লোক, প্রত্যেকের ক্ষুধার যন্ত্রণা সে প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে লাগল, তাই অবশেষে সে বিপুল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে পারল না, কেবল একবার মাত্র তাদের সঙ্গে “অন্ন-চাই” বলেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই রাত্রে একটা নরম হাত বৃদ্ধের শীতল হাতকে চেপে ধরল; আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে সে তার কেঁচড়ে ভরা চাল দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

[‘দুর্বোধ’ গল্পটি ২৮শে মে ১৯৪৩-এর অরণি পত্রিকায় চিত্র-গল্প হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।]

ভদ্রলোক

“শিয়ালদা-জোড়-মন্দির-শিয়ালদা” তীব্র কণ্ঠে বার কয়েক চিৎকার করেই সুরেন ঘণ্টি দিল ‘ঠন্ ঠন্’ করে। বাইরে এবং ভেতরে, ঝুলন্ত এবং অনন্ত যাত্রী নিয়ে বাসখানা সুরেনের ‘যা-ওঃ, ঠিক হ্যাঁ’ চিৎকার শুনেই অনিচ্ছক ও অসুস্থ নারীর মতো গোঙাতে গোঙাতে অগ্রসর হল। একটানা অস্বস্তিকর আওয়াজ ছড়াতে লাগল উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ।

“টিকিট, বাবু, টিকিট আপনাদের”—অপরূপ কৌশলের সঙ্গে সেই নিশ্চিহ্ন ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সুরেন প্রত্যেকের পয়সা আদায় করে বেড়াতে লাগল। আগে ভিড় তার পছন্দ হ’ত না, পছন্দ হ’ত না অনর্থক খিটি-মিটির আর গালাগালি। কিন্তু ড্রাইভারের ক্রমাগত প্ররোচনায় আর কমিশনের লোভে আজকাল সে ভিড় বাড়াতে ‘লেট’-এরও পরোয়া করে না। কেমন যেন নেশা লেগে গেছে তার : পয়সা— আরো পয়সা; একটি লোককে, একটি মালকেও সে ছাড়বে না বিনা পয়সায়।

অথচ দু’মাস আগেও সুরেন ছিল সামান্য লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলে। দু’মাস আগেও সে বাসে চড়েছে কন্ডাকটর হয়ে নয়, যাত্রী হয়ে। দু’মাসে সে বদলে গেছে। খাকির জামার নীচে ঢাকা পড়ে গেছে ভদ্রলোকের চেহারাটা। বাংলার বদলে হিন্দী বুলিতে হয়েছে অভ্যস্ত। হাতের রিস্টওয়াচটাকে তবুও সে ভদ্রলোকের নিদর্শন হিসাবে মনে করে; তাই ওটা নিয়ে তার একটু গর্বই আছে। যদিও কন্ডাকটরী তার সাথে গেছে, তবুও সে নিজেকে মজুর বলে ভাবতে পারে না। ঘামে ভেজা খাকির জামাটার মতোই অস্বস্তিকর ঐ ‘মজুর’ শব্দটা।

—এই কন্ডাকটর, বাঁধো, বাঁধো। একটা অতিব্যস্ত প্যাসেঞ্জার উঠে দাঁড়াল। তবুও সুরেন নির্বিকার। বাস ‘স্টপেজ’ ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। লোকটি খান্না হয়ে উঠল : কী শুনতে পাওনা না কি তুমি? সুরেনও চোখ পাকিয়ে বলল : আপনি ‘তুমি’ বলছেন কাকে?

—তুমি বলব না তো কি ‘হুজুর’ বলব? লোকটি রাগে গজগজ করতে করতে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল। প্যাসেঞ্জারদেরও কেউ কেউ মন্তব্য করল : কন্ডাকটররাও আজকাল ভদরলোক হয়েছে, কালে কালে কতই হবে।

একটি পান-খেকো লুঙ্গিপরা লোক, বোধহয় পকেটমার, হেসে কথাটা সমর্থন করল। বলল : মার না খেলে ঠিক থাকে না শালারা, শালাদের দেমাক হয়েছে আজকাল।

আগুন জ্বলে উঠল সুরেনের চোখে। নাঃ, একদিন নির্ঘাৎ মারামারি হবে।...একটা প্যাসেঞ্জার নেমে গেল। ধাঁই-ধাঁই বাসের গায়ে দু’তিনটে চাপড় মেরে চৈঁচিয়ে উঠল সুরেন; যা-ওঃ। রাগে গরগর করতে করতে সুরেন ভাবল : ওঃ, যদি মামা তাকে না তাড়িয়ে দিত বাড়ি থেকে। ...তা হলে কি আর...কি এমন আর অপরাধ করেছিল সে। ভাড়াটেদের মেয়ে গৌরীর সঙ্গে প্রেম করা কি গো-মাংস খাওয়ার মতো অপরাধ? উনিশ বছর বয়সে থার্ড ক্লাশে উঠে প্রেম করে না কোন মহাপুরুষ?

-এই শালা শুয়ার কি বাচ্চা, ড্রাইভারের সঙ্গে সুরেনও চৈঁচিয়ে উঠল। একটুকুর জন্যে চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল লোকটা। আবার ঘন্টি দিয়ে সুরেন চৈঁচিয়ে উঠল : যা-ও, ঠিক হয়। লোকটার ভাগ্যের তারিফ করতে লাগল সমস্ত প্যাসেঞ্জার।

সুরেনকে কিছুতেই মদ খাওয়াতে পারল না রামচরণ ড্রাইভার। সুরেন বোধহয় এখনো আবার ভদ্রলোক হবার আশা রাখে। এখনো তার কাছে কুৎসিত মনে হয় রামচরণদের ইঙ্গিতগুলো। বিশেষ করে বীভৎস লাগে রাত্রিবেলার অনুরোধ। ওরা কত করে গুণ ব্যাখ্যা করে মদের : মাইরি মাল না টানলে কি দিনভোর এমন গাড়ি টানা যায়? তুই খেয়ে দেখ, দেখবি সারাদিন কত ফুর্তিতে কাজ করতে পারবি। তাই নয়? কি বল গো পাঁড়েজী?

পাঁড়েজী ড্রাইভার মাথা নেড়ে রামচরণের কথা সমর্থন করে। অনুরোধ ক’রে ক’রে নিষ্ফল হয়ে শেষে রামচরণ রুখে উঠে ভেঙিচি কেটে বলে : এঃ শালা আমার গুরু-ঠাকুর এয়েছেন।

সুরেন মৃদু হেসে সিগারেট বার করে।

যথারীতি সেদিনও “জোড়-মন্দির-জোড়-মন্দির” বলে হাঁকার পর গাড়ি ছেড়ে দিল। উঁ-উঁ-উঁ শব্দ করতে করতে একটা স্টপেজে এসে থামতেই সুরেন চৈচিয়ে উঠল : জলদি করুন বাবু, জলদি করুন। এক ভদ্রলোক উঠলেন স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিয়ে। সুরেন অভ্যাস মতো “লেডিস সিট ছেড়ে দিন আপনারা” বলেই আগন্তুকদের দিকে চেয়ে চমকে উঠল— একি, এরা যে তার মামার বাড়ির ভাড়াটেরা। গৌরীও রয়েছে এদের সঙ্গে। সুরেনের বুকের ভিতরটা ধব্-ধব্ কাঁপতে লাগল বাসের ইঞ্জিনটার মতো। ভাড়াটেবাবু সুরেনকে এক নজর দেখে নিলেন। তাঁর বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটো হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিল : মা, মা, আমাদের সুরেন-দা, ঐ দ্যাখো সুরেন-দা। কী মজা! ও সুরেন-দা, বাড়িতে যাওনা কেন? এ্যাঁ?

গাড়ি শুদ্ধ লোকের সামনে সুরেন বিব্রত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ টিকিট দিতেই মনে রইল না তার। ভদ্রলোক ধমকে নিরস্ত করলেন তার ছেলেমেয়েদের। কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সবকিছুই-বন্ধ হয়ে গেল সুরেনের হাঁক ডাক। একবার আড়চোখে তাকাল সে গৌরীর দিকে—সে তখন রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। আস্তে আস্তে সে বাকী টিকিটের দামগুলো সংগ্রহ করতে লাগল। বাসের একটানা উঁ-উঁ-উঁ শব্দকে এই প্রথম তার নিজের বুকের আর্তনাদ বলে মনে হল। কন্ডাকটরীর দুঃসহ গ্লানি ঘাম হয়ে ফুটে বেরুল তার কপালে।

গৌরীর বিমুখ ভাব সুরেনের শিরায় শিরায় বইয়ে দিল তুষারের ঝড়; দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত মনে হল বাসের ঝাঁকুনি-দেওয়া গতি। বহুদিনের রক্ত-জাল-করা পরিশ্রম আর আশা চূড়ান্ত বিন্দুতে এসে কাঁপতে লাগল স্পিডোমিটারের মতো। একটু চাহনি, একটু পলক ফেলা আশ্বাস, এরই জন্যে সে কাঁধে তুলে নিয়েছিল কন্ডাকটারের ব্যাগ। কিন্তু আজ মনে হল

বাসের সবাই তার দিকে চেয়ে আছে, সবাই মৃদু মৃদু হাসছে, এমন কি গৌরীর বাবাও। ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা হল সুরেনের টাকাকড়ি-শুদ্ধ কাঁধে ঝোলান ব্যাগটা।

ওরা নেমে যেতেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঘন্টি মেরে দুর্বল স্বরে হাঁকল : যা-ওঃ। কিন্তু ‘ঠিক হয়’ সে বলতে পারল না। কেবল বার বার তার মনে হতে লাগল : নেহি, ঠিক নেহি হয়।

সেদিন রাত্রে সুরেন মদ খেল, প্রচুর মদ। তারপর রামচরণকে অনুসরণ করল। যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়াই রামচরণের কাজ। সে আজ সুরেনকে পৌঁছে দিল সৌখিন ভদ্রসমাজ থেকে ঘা-খাওয়া ছোটলোকের সমাজে।

[‘ভদ্রলোক’ গল্পটি অরণিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।]